নাট্যকার - নাট্যসাহিত্য

ভাস

কবি পরিচয় ঃ সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন আদিকবি বলতে বাল্মীকিকে বুঝায়, সেই রূপ আদি নাট্যকার বলতে ভাস। ভাসের নাম প্রথম শুনতে পাওয়া যায় কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকের ভূমিকায়। তারপর বাণভট্টের কাব্যে তাঁর নাটকের কতকগুলি অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে পারা যায়। অবশেষে রাজশেখরের উক্তির মাধ্যমে তাঁর নাটকচক্র — অর্থাৎ বেশ কতকগুলি নাটক আছে বুঝা গেলেও একমাত্র 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকটির নাম জানা যায়।

ভারতীয়দের দুর্ভগ্য ও পরিতাপের বিষয় যে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পূর্বে এরূপ একজন কবিজনবন্দিত প্রথিত যশা নাট্যকারের নাটকগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য মেলেনি।

১৯১০ থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পন্ডিত টি. গণপতি শাস্ত্রী দক্ষিণ ভারতের মনলিক্করনাথম্ নামক স্থানে দুখানি তালপাতার পুঁথিতে মালায়লম হরফে লেখা সংস্কৃত নাটকের পান্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। একখানি পুঁথিতে দেখা গেল দশটি নাটকআছে — (১) স্বপ্নবাসদত্তা, (২) প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ, (৩) পঞ্চরাত্র, (৪) চারুদত্ত, (৫) দূতঘটোৎকচ, (৬) অবিমারক, (৭) বালচরিত, (৮) মধ্যমব্যায়োগ, (৯) কর্ণভার, (১০) ঊরূভঙ্গ। তারপর অপরটিতে আরও তিনটি রূপক পাওয়া যায় — (১) প্রতিমানাটক, (২) অভিষেক নাটক ও (৩) দূতবাক্য। এইভাবে মোট তেরখানি রূপকের আবিষ্কার ঘটে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে সেগুলিকে ভাসের নামাঙ্কিত করে প্রকাশ করা হয়।

ভাস সমস্যা ঃ পান্ডুলিপিতে ভাসের নাম লিখিত না থাকায় অনেকেই এগুলিকে ভাসের রচনা বলে স্বীকার করলেন না। সুতরাং আবিষ্কৃত নাটকগুলির রচয়িতা ভাস বা অন্য কেহ — এ বিষয়ে পন্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হওয়ায় এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হল। সংস্কৃত নাটকের ইতিহাসে এই সমস্যাটি ভাস সমস্যা (Bhasa Problem) নামে কথিত।

ভাসই যে এই নাটকগুলির রচয়িতা — একথা কীথ, টমাস, পরাঞ্জপে ও ওয়েবর প্রমুখ পন্ডিত গণ স্বীকার করেন। তাঁদের পক্ষে যুক্তি হলো —

(১) তেরখানি নাটকেরই ভাব, ভাষা, বাগ্‌ভঙ্গী ও রচনাশৈলী স্বতন্ত্র এবং একই ধরণের।

(২) বাণের উল্লিখিত 'সূত্রধারকৃতারম্ভৈঃ' লক্ষণটি তেরটি নাটকেই বিদ্যমান।

Scanned by CamScanner

প্রত্যেকটি নাটকের আরম্ভ হয়েছে 'নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ' বলে সূত্রধারকে দিয়ে।

(৩) সমস্ত নাটকেই 'প্রস্তাবনা' অংশকে 'স্থাপনা' নাম দেওয়া হ'য়েছে।

(৪) কোন নাটকেরই প্রস্তাবনায় নাটক ও নাট্যকারের নাম নাই, — যা সংস্কৃত নাটকের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৫) প্রায় সকল নাটকেই ভরতবাক্য একইরকম প্রার্থনায় শেষ হ'য়েছে।

(৬) নাটকগুলিতে নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ প্রায়ই লঙ্ঘিত হ'য়েছে। রঙ্গমঞ্চে যুদ্ধ, মৃত্যু, প্রভৃতি দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে।

(৭) অনেকগুলি উক্তি আছে, যেগুলি উক্ত তেরটির মধ্যে পাঁচ-ছয়টি নাটকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

(৮) একাধিক নাটকে নায়ক নায়িকার মিলনকে চন্দ্রের সঙ্গে নক্ষত্রের মিলন রূপে বর্ণনা করেছে।

(৯) আবিষ্কৃত ১৩ টি নাটকেই প্রায় একজাতীয় প্রাকৃতভাষার ব্যবহার আছে।

(১০) নাটকগুলিতে অপাণিনীয় প্রয়োগ একই রীতির।

(১১) বাণভট্ট উল্লিখিত পতাকাস্থানের বাহুল্যও নাটকগুলিতে লক্ষণীয়।

উপরি উক্ত যুক্তিগুলির সাহায্যে গণপতি শাস্ত্রীর সহিত একমত হয়ে কীথ, ওয়েবর প্রমুখ পন্ডিতগণ তেরখানি নাটকই একই ব্যক্তির রচনা বলে সিদ্ধান্ত করেন এবং সেই সঙ্গে 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' ভাসরচিত বলে পূর্বসিদ্ধান্ত থাকায় আবিষ্কৃত তেরখানি নাটকই ভাসের রচিত বলে স্বীকার করেন।

এই মতের বিরোধিতা করে বার্ণেট ও জনসন প্রমুখ পন্ডিতগণ। কয়েকটি দুর্বল যুক্তিও উত্থাপন করেন। যেমন —

(১) 'নান্দ্যন্তে ততঃ' বলে যে নাটকের আরম্ভ — তা দক্ষিণ ভারতীয় বৈশিষ্ট্য।

(২) নাটকগুলিতে যে একরূপ নাট্যশৈলীর কথা বলা হয়েছে তাও সমগ্র দক্ষিণ ভারতীয় নাটকেরই বৈশিষ্ট্য।

(৩) নাট্যশাস্ত্রবিধি লঙঘন ও অপাণিনীয় প্রয়োগ পরবর্তী নাটক ও মহাকাব্যাদিতেও দেখতে পাওয়া যায়।

(৪) অন্যত্র প্রাপ্ত 'স্বপ্নবাসবদত্তমের' উক্তিগুলি বর্তমানে প্রাপ্ত 'স্বপ্নবাসবদত্তমে' সর্বাংশে মিলে না।

(৫) এগুলি সম্ভবতঃ কেরল অঞ্চলের চাক্কিয়ার নামক ভ্রাম্যমান নাট্য সম্প্রদায়ের লেখা।

এই সমস্ত বিরুদ্ধ যুক্তির উত্থাপন হলেও গণপতি শাস্ত্রীর অভিমত অনুসারে

Scanned by CamScanner

আবিষ্কৃত নাটকগুলি ভাসরচিত বলেই প্রচলিত আছে। অধ্যাপক ভিন্টারনিৎস ও সুকথঙ্করও বলেছেন, এই নাটকগুলি অন্য কোন ব্যক্তির রচনা বলে দৃঢ় নির্ভরযোগ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ভাসকেই এই নাট্যসমূহের রচয়িতা রূপে স্বীকার করায় বাধা নাই। অর্থাৎ শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়।

ভাসের কাল ঃ যে কবির নাম প্রথম শোনা যায় চতুর্থ শতাব্দীতে এবং যাঁর রচনার সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয় ঘটে বিংশ শতাব্দীতে সেই কবি ভাসের সঠিক আবির্ভাব কাল নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে যেহেতু কালিদাসের নাটকে ও বাণভট্টের কাব্যে ভাসের উল্লেখ আছে, সেজন্য ভাস অবশ্যই কালিদাস ও বাণভট্টের পূর্ববর্তী বলা যায়। আবার ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে ভাসের প্রাকৃত অশ্বঘোষের প্রাকৃত অপেক্ষা অর্বাচীন বলায় ভাসের আবির্ভাব কাল অশ্বঘোষের পরে ও কালিদাসের আগে বলা হয়। কালিদাস ছিলেন সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের কবি আর অশ্বঘোষের আবির্ভাব কাল খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে দ্বিতীয় শতকে। সুতরাং মহাকবি ভাস খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন — এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হবে না।

ভাসের নাটক চক্র — ভাসের নামাঙ্কিত তেরখানি নাটককে বিষয়বস্তুর বিচারে চারভাগে ভাগ করা হয়। যেমন —

ক) রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত —

(১) প্রতিমা নাটক ও (২) অভিষেক নাটক।

খ) মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত —

(৩) পঞ্চরাত্র (৪) দূতবাক্য (৫) দূতঘটোৎকচ (৬) মধ্যমব্যায়োগ (৭) কর্ণভার (৮) উরুভঙ্গ।

গ) ভাগবত পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত একখানি নাটক —

(৯) বালচরিত।

ঘ) প্রচলিত প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে রচিত —

(১০) প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ, (১১) স্বপ্নবাসবদত্ত (১২) চারুদত্ত (১৩) অবিমারক।

॥ নাটক সমূহের কাহিনীসার ॥

১) প্রতিমা নাটকম্ ঃ সাতটি অঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকটি রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। দশরথ কর্তৃক রামের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ, কৈকেয়ীর প্রার্থনায় ভরতের রাজ্য লাভ, লক্ষ্মণ ও সীতাসহ রামের বনগমন, এবং বনবাস থেকে রাবণ বধ করে রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন এবং রামের রাজ্যভার গ্রহণ পর্যন্ত কাহিনী এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। রামের বনবাসের দুঃখে দশরথের মৃত্যু হলে তাঁর মূর্তি পূর্বপুরুষদের মূর্তির সঙ্গে প্রতিমা গৃহে স্থাপন করা হয়। ভরত মাতুলালয় থেকে ফেরার পথে পূর্ব-পুরুষদের

Scanned by CamScanner

প্রণাম করতে গিয়ে দশরথের মূর্তি দেখে বুঝিতে পারেন যে, দশরথের মৃত্যু হয়েছে। তারপর রামায়ণের কাহিনী অনুসারে অন্যান্য ঘটনাগুলির সন্নিবেশে নাটকটির পরিসমাপ্তি হয়েছে। এই নাটকের অভিনবত্ব ঐ প্রতিমাগৃহ ও ইক্ষ্বাকু-বংশীদের প্রতিমা স্থাপন। ঐ প্রতিমা গৃহের ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়েই নাটকের নামকরণ হয়েছে 'প্রতিমা নাটকম্'।

২) **অভিষেক ঃ** মহাকবি ভাস রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড, সুন্দরকান্ড ও লঙ্কাকান্ডের কাহিনীকে উপজীব্য করে এই নাটকখানি রচনা করেন। এটি ছয় অঙ্কে বিভক্ত। সীতাহরণের পর সুগ্রীবের সহিত রামের বন্ধুত্ব স্থাপন, রাম কর্তৃক বালিবধ, সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক, হনুমানের লঙ্কাগমন, সীতাকে সান্ত্বনাদান, সেতুবন্ধন, লক্ষণ কর্তৃক ইন্দ্রজিতের নিধন, তা শুনে রাবণের মোহ, রাবণের সীতা হত্যার সঙ্কল্প, রাবণের যুদ্ধ, রাবণ বধ এবং অবশেষে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক — এগুলিই অভিষেক নাটকের উপস্থাপনীয় বিষয়বস্তু। অভিষেকেই নাটকের চরমপরিণতি বলে নাটকটির নামকরণ হয়েছে 'অভিষেক'।

৩) **পঞ্চরাত্রম্ ঃ** মহাভারতের বিরাট পর্বে বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে কবিকল্পনা মিশ্রিত করে তিন অঙ্কবিশিষ্ট এই নাটকটি রচিত। এই নাটকটিকে 'সমবকার' শ্রেণীর রূপক বলা হয়। পঞ্চরাত্র নাটকে দেখান হয়েছে, পান্ডবদের অজ্ঞাতবাসের বৎসর প্রায় যখন শেষ হ'তে চলেছে, তখনই দুর্যোধন একটি যজ্ঞ সম্পাদন করে দ্রোণাচার্যকে তাঁর ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা প্রার্থনা করতে বলেন। দ্রোণাচার্য এ সময় দুর্যোধনের কাছে — পান্ডবদের জন্য অর্ধেক রাজত্ব প্রার্থনা করেন। দ্রোণাচার্যের এই প্রার্থনায় দুর্যোধন শর্ত আরোপ করলেন যে, তিনি পাঁচরাত্রির মধ্যে পান্ডবদের সন্ধান দিতে পারলে তিনি আচার্যের ঐ প্রার্থনা পূরণ করবেন। এরপর ভীষ্মের নির্দেশে কৌরবগণ বিরাটরাজের গোধন হরণ করতে গেলে বিরাট গৃহে আত্মগোপনকারী পান্ডবগণ বিরাটের পক্ষ অবলম্বন করে কৌরবদের পরাস্ত করেন। তবে এই যুদ্ধের মাধ্যমে পান্ডবদের সন্ধান পাওয়া গেল। ফলে দ্রোণাচার্যের প্রার্থনানুসারে পান্ডবদের কুরুরাজ্যের অর্ধেক অংশ দেওয়া হ'লো। এখানেও ঐ পঞ্চরাত্রকে প্রাধান্য দিয়েই 'পঞ্চরাত্রম্' নামকরণ হ'য়েছে।

৪) **দূতবাক্যম্ ঃ** মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এটি একটি একাঙ্ক রূপক। দূতবাক্য রূপকে দেখান হ'য়েছে, — পান্ডবদের দূত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে আসছেন শুনেই দুর্যোধন আদেশ করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যেন কোন রূপ সম্মান প্রদর্শন করা না হয়। তারপর শ্রীকৃষ্ণ সভাগৃহে এসে পান্ডবদের প্রাপ্য রাজ্যাংশের দাবি জানালেন। দুর্যোধন সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করে শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করার চেষ্টা করলে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখালেন। শেষে ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ শান্ত হলেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যই প্রধান নাটকীয় বস্তু হওয়ায় নাটকের নামকরণ হয়েছে 'দূতবাক্যম্'।

৫) **দূতঘটোৎকচম্ ঃ** মহাকবি ভাস রচিত এটি একটি একাঙ্ক রূপক। মহাভারতের কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে রচিত এই নাটকের বিষয়বস্তু হলো — অন্যায়যুদ্ধে অভিমন্যুকে হত্যা করে কৌরবরা আনন্দিত হলেও ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী এ কাজের তীব্র নিন্দা করেন এবং নূতন কোন বিপদের আশংকায় উদ্‌বেগের মধ্যে থাকেন। অপরদিকে

Scanned by CamScanner

পুত্রের মৃত্যুতে শোকাহত অর্জুন পুত্রহন্তাকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করেন। এমন সময় পান্ডবদের দূত হয়ে ঘটোৎকচ কৌরবসভায় উপস্থিত হ'লে কৌরবরা তাকে অপমান করেন। এতে ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের হাতে কৌরবদের আশু বিনাশের কথা ঘোষণা করেন। ঘটোৎকচের দৌত্যই নাটকীয় প্রতিপাদ্য বলে নাটকটির নাম 'দূত ঘটোৎকচম্'।

৬) **মধ্যমব্যায়োগম্ ঃ** মহাভারতের কয়েকটি চরিত্র অবলম্বনে ভাস কর্তৃক রচিত এটি একটি একাঙ্ক নাটক। নাট্য বৈশিষ্ট্য অনুসারে এটি 'ব্যায়োগ' শাখার অন্তর্ভুক্ত। নাটকটির বিষয়বস্তু হলো — নরমাংস দ্বারা মাতার ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য ঘটোৎকচ এক ব্রাহ্মণ দম্পতীর মধ্যমপুত্রকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে যেতে থাকলে ভীম ঘটোৎকচের হাত থেকে ব্রাহ্মণ পুত্রকে রক্ষা করতে আসেন। পিতাপুত্রে তুমুল যুদ্ধ হলো। কেউ কাউকে চিনল না। শেষে ভীম পরাক্রম দেখিয়ে ঘটোৎকচকে বিস্মিত করে তার সঙ্গে গেলেন। পুরে হিড়ম্বা এসে স্বামীকে দেখে আনন্দে অভিবাদন জানালে পিতা-পুত্রে পরিচয় হল। ব্রাহ্মণপুত্র মুক্তি পেল এবং পিতা-পুত্রের মিলন ঘটল। কবি কল্পিত এই নাট্য কাহিনীটি বীর, বাৎসল্য এবং কৌতুকরসের সমন্বয়ে রচিত।

মধ্যম সন্তানকে অবলম্বন করে ব্যায়োগটি রচিত বলে এই ব্যায়োগটির নামকরণ হয়েছে 'মধ্যমব্যায়োগ'।

৭) **কর্ণভারম্ ঃ** এটি মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত একটি একাঙ্ক নাটক। এই নাটকের বিষয়বস্তু হলো — কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণ কৌরব পক্ষের সেনাপতি হয়ে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবার জন্য যখন প্রস্তুত হয়েছেন, সে সময় দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে ছলনা করে কর্ণের সহজাত কবচকুন্ডলখানি প্রার্থনা করলে সারথি শল্যরাজ নিষেধ করলেও দাতা কর্ণ প্রার্থীর প্রার্থনাপূরণ করার জন্য কবচকুন্ডল দান করলেন। পরে ইন্দ্র 'বিমলা' নামে একটি অব্যর্থ একাঘ্নী অস্ত্র কর্ণকে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য এক দেবদূতের হাতে পাঠান। এই রূপকে অসামান্য দানের দ্বারা কর্ণের ভার অর্থাৎ গৌরব প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে বলে এর নামকরণ হয়েছে — 'কর্ণভারম্'।

৮) **উরুভঙ্গম্ ঃ** এটি মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত মহাকবি ভাসের একটি একাঙ্ক নাটক। এই নাটকে দেখান হয়েছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষদিনে ব্যাস, শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও বলরামের সমক্ষে গদাযুদ্ধে ভীম অন্যায়ভাবে আঘাত করে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করলে আত্মীয়বর্গ যুদ্ধস্থানে এসে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং অশ্বত্থামা প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি অচিরেই পান্ডবকুল ধ্বংস করবেন। তারপর দুর্যোধন স্বপ্নে মৃত ভ্রাতাদের দেখতে পেলেন এবং সেখানেই তিনি দেহত্যাগ করলেন।

উরুভঙ্গই সংস্কৃত সাহিত্যে একমাত্র বিয়োগান্ত নাটক।

৯) **বালচরিতম্ ঃ** মহাকবি ভাস শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণকাহিনীকে অবলম্বন করে এই নাটকটি রচনা করেন। এটি পাঁচ অঙ্কে নিবদ্ধ। এই নাটকটিতে প্রস্তাবনায় সূত্রধারের মুখে চার যুগে বিষ্ণুর চার অবতারের স্তুতি এবং শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণু বলে কথন।

Scanned by CamScanner

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, শৈশব, পূতনা ও চানূর বধ, কালীয় দমন, প্রভৃতি অলৌকিক কার্যাবলী, ঋষভানু ও কংস বধ, উগ্রসেনের অভিষেক এবং গোপসমাজের মঙ্গলবিধান প্রভৃতি ভাগবতপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ঘটনাগুলি পরিবেশিত হয়েছে। এই নাটকে রাধা ও অন্যান্য গোপী অথবা তাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা প্রভৃতি প্রচলিত কাহিনীগুলির উল্লেখ নাই।

১০) **প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্ ঃ** মহাকবি ভাস এই নাটকটির কাহিনী 'বৃহৎকথা' থেকে নিয়েছেন। এটি চার অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক। এর নাটকীয় বিষয় বস্তু হলো উজ্জয়িনী-রাজ প্রদ্যোত মহাসেন তাঁর কন্যা বাসবদত্তার সঙ্গীত শিক্ষার জন্য কৌশলে বৎসরাজ উদয়নকে ধরে আনেন এবং উদয়নের বিখ্যাত ঘোষবতী বীণাটি কেড়ে নিয়ে কন্যাকে দান করেন। উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ একথা জানতে পেরে প্রতিজ্ঞা করলেন যে,প্রভুকে মুক্ত করতে না পারলে নিজের নাম ত্যাগ করবেন। তারপর তিনি ছদ্মবেশে উজ্জয়িনীতে এসে জানতে পারলেন যে, উদয়ন ও বাসবদত্তা পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত। তখন তিনি নানা কৌশলে নিজে বন্দী হয়েও বাসবদত্তাসহ উদয়নকে বৎসরাজ্যে পাঠিয়ে দেন। অবশেষে যৌগন্ধরায়ণের সহিত মহাসেনের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং মহাসেন উদয়নকে জামাতা রূপে স্বীকার করেন। সেসময় কন্যা ও জামাতা সেখানে উপস্থিত না থাকায় মহাসেন ছবিতে উদয়ন ও বাসবদত্তার বিবাহ দেন।

এই নাটকে প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যৌগন্ধরায়ণের কূটনীতি প্রয়োগবিধি মুখ্য প্রতিপাদ্য হওয়ায় নামকরণ হয়েছে প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ।

১১) **স্বপ্নবাসবদত্তম্ ঃ** মহাকবি ভাস গুণাঢ্যের বৃহৎকথার একটি কাহিনীকে অবলম্বন করে এই নাটকটি রচনা করেছেন। এই নাটকটিকে ভাসের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ছয় অঙ্কে রচিত এই নাটকটি মূলতঃ প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণে বর্ণিত কাহিনীর পরবর্তী অধ্যায় স্বরূপ।

এই নাটকে দেখান হয়েছে — রাণী বাসবদত্তার প্রেমে আচ্ছন্ন উদয়নের রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশ শত্রু দ্বারা অধিকৃত হয়। তখন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ হৃতরাজ্য উদ্ধারের জন্য মগধরাজ দর্শকের সহায়তা পাওয়ার ইচ্ছা করে তাঁর ভগিনী পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহ ঘটাতে উদ্যোগী হ'লেন। কিন্তু বাসবদত্তা থাকতে উদয়ন অপর কোন নারীকে বিবাহ করবে না জেনে বাসবদত্তার সঙ্গে পরামর্শ করে বাসবদত্তা আগুনে পুড়ে মরেছে প্রচার করে তাঁকে লুকিয়ে নিয়ে এসে অবন্তিকা নামে ভগ্নী বলে পদ্মাবতীর কাছেই গচ্ছিত রাখলেন। বাসবদত্তা সেখানে অবন্তিকা নামেই থাকলেন। এরপর যৌগন্ধরায়ণ ও বাসবদত্তার প্রচেষ্টায় উদয়নের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিবাহ হলেও বাসবদত্তা উদয়নের মনে জীবিতাই রয়ে গেলেন। শেষে যৌগন্ধরায়ণের কুটনীতিতে উদয়নের সমস্ত রাজ্য উদ্ধার হলে হঠাৎ একদিন মহাসেনের কাছ থেকে বাসবদত্তার ধাত্রী উদয়নের সভায় কন্যা বাসবদত্তার একটি ছবি পাঠালেন। পদ্মাবতী ছবি দেখেই বুঝতে পারলেন যে অবন্তিকাই যথার্থ বাসবদত্তা। এসময় পরিব্রাজকবেশে যৌগন্ধরায়ণও ফিরে আসেন। তিনিই তাঁর সমস্ত রহস্য উদঘাটন করেন এবং বাসবদত্তার সঙ্গে উদয়নের আবার মিলন ঘটান। এর

Scanned by CamScanner

মধ্যে প্রথমে স্বপ্নে বাসবদত্তাকে উদয়ন দর্শন করেন এবং সেখানেই তাঁদের পুনর্মিলনের বীজ অঙ্কুরিত হয়। তাই 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নামকরণ সার্থক হয়েছে।

নিখুঁত চরিত্রচিত্রণ ও কাহিনীর ঘটনাবিন্যাসকৌশল নাটকটিকে অভিনবত্ব দান করেছে।

১২) চারুদত্তম্ ঃ প্রচলিত কাহিনীকে অবলম্বন করে মহাকবি ভাস এই নাটকটি রচনা করেন। এটি চার অঙ্ক বিশিষ্ট একটি অসম্পূর্ণ নাটক। চারুদত্তম্ ও মৃচ্ছকটিকম্ নাটকের কাহিনী ও ঘটনাবিন্যাস প্রায় একপ্রকার। অনেকগুলি শ্লোকও একপ্রকার। এর নাটকীয় বিষয়বস্তু হলো বণিক চারুদত্তর প্রতি প্রণয়াসক্তা গণিকা বাসবদত্তা একদিন দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য চারুদত্তর গৃহে আশ্রয় নেন এবং তাঁর মূল্যবান গহনাগুলি তার কাছে গচ্ছিত রেখে আসেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একরাত্রিতে সেই গহনাগুলি চুরি হয়ে যায় এবং ঘটনাক্রমে গহনাগুলি বসন্তসেনার হাতেই পড়ে। এদিকে চারুদত্ত গচ্ছিত বস্তু চুরি গেছে বলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে নিজের স্ত্রীর মুক্তা মালাটি বসন্তসেনার নিকট পাঠান। তার ফলে বসন্তসেনার অনুরাগ ও প্রণয় চারুদত্তের প্রতি আরও বেড়ে যায়। এবার তিনি একদিন ঐ মুক্তামালাটি গলায় পরে চারুদত্তের গৃহে অভিসারে যাবেন বলে মনস্থ করেন। এইখানেই নাটকটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ হয়েছে।

১৩) অবিমারকম্ ঃ মহাকবি ভাস প্রচলিত কাহিনী অবলম্বন করে এই নাটকটি রচনা করেছেন। এই নাটকটি ছয় অঙ্ক বিশিষ্ট। নাটকটিতে দেখান হয়েছে —

রাজকুমার বিষ্ণুসেন ঋষির অভিশাপে চন্ডাল হ'য়ে 'অবি' নামে এক অসুরকে হত্যা করে 'অবিমারক' নামে পরিচিত হয়। একদিন সে কুন্তীভোজের কন্যা কুরঙ্গীকে একটি হাতীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে তার প্রণয়ভাজন হয়। কিন্তু হীনজাতির সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হওয়া অসম্ভব জেনে তারা গোপনে মিলিত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কথা প্রকাশিত হয়ে পড়লে অবিমারক পালিয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করল। তখন এক বিদ্যাধর দয়াপরবশ হয়ে তাকে একটি আংটি দেন। ঐ আংটির প্রভাবে অবিমারক অদৃশ্য হয়ে প্রাসাদে গিয়ে দেখে রাজকন্যা মনের দুঃখে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন। অবিমারক তখন তাকে বাঁচান। এ সময় নারদ এসে তাকে শাপমুক্ত করে তার প্রকৃত পরিচয় দিলে সকলের সম্মতিতেই কুরঙ্গীর সঙ্গে অবিমারকের বিবাহ হয়।

ভাস প্রতিভা ঃ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে ভাসের স্থান সকলের উর্ধ্বে। কালিদাস, ভবভূতির নাটকগুলি দৃশ্যকাব্য অপেক্ষা শ্রব্যকাব্যরূপে অধিক উপাদেয়। কিন্তু ভাসের নাটক সম্পূর্ণই দৃশ্যকাব্য। তিনি ছিলেন যথার্থ নাট্যকার। তিনি নাট্য রচনায় রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি কাহিনীকে উপজীব্য করলেও স্বকীয় নাট্য-প্রতিভায় সেগুলিকে নাট্যরসে সঞ্জীবিত করে সম্পূর্ণ নূতন রূপ দান করেছেন। ভাস অত্যন্ত মিতভাষী, তাই তাঁর নাটকগুলিতে নিসর্গবর্ণনার বাহুল্য নাই। তিনি সর্বত্র পরিমিত ও নির্ধারিত শব্দ ব্যবহার করে নিজের দক্ষতা ও বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সর্বত্র সরল ভাষা ও সরস ভঙ্গীতে নাট্যবিষয়গুলি পরিবেষণ করেছেন। তার রচনাশৈলীর বিশেষত্ব হলো

Scanned by CamScanner

— জীবনধর্মিতা, বিষয়ানুকূল পরিবেশ রচনা, বস্তুসঙ্গতি স্থাপন, ঘটনাপ্রবাহের গতিশীলতা এবং সর্বোপরি সুখবোধ্যতা। এই জন্যই ভাসের নাট্যগ্রন্থগুলি যথার্থ দৃশ্যকাব্য হয়েছে।

ভারতীয় সাহিত্যে তিনিই স্ত্রীবর্জিত নাটক ও একাঙ্ক নাটকের প্রথম প্রবর্তক। তিনিই সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটক রচনা করে নাটকীয় অভিনবত্ব সম্পাদন করেছেন। আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, সংস্কৃত নাট্যকারগণের মধ্যে ভাসই সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক নাটকের রচয়িতা।

ছন্দঃ ও অলঙ্কার প্রয়োগেও তাঁর নৈপুণ্য লক্ষণীয়। তাঁর নাটকে বসন্ত তিলক ছন্দের বাহুল্য থাকলেও পরিবেশ হিসাবে স্রগ্‌ধরা ও শার্দূলবিক্রীত ছন্দঃ ব্যবহারেও কার্পণ্য নাই।

পরবর্তীকালে কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ মহাকবিগণের নাট্যরচনায় ভাসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং নাট্যকার ভাসকে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে প্রথম পথিকৃৎ বলা অসঙ্গত হবে না।

কালিদাস

সূচনা-উৎস ঃ সংস্কৃত সাহিত্যজগতে যিনি, কি কাব্যে, কি নাটকে, কি বিভিন্ন শাস্ত্রে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে কবিকুলচূড়ামণি শিরোপাটি স্বচ্ছন্দে অর্জন করেছেন তিনি হলেন মহাকবি কালিদাস। দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে তাঁর কবিকৃতি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। কিন্তু দুভার্গ্যের বিষয়, অতীত দিনের কোন শুভলগ্নে ভারতের কোন জনপদকে কৃতার্থ করে এই ক্ষণজন্মা কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা আজও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত আছে।

কালিদাসের নাট্য প্রতিভা ঃ কালিদাসের নাটকগুলি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে যথোচিত সমাদৃত হলেও কালিদাস ছিলেন মুখ্যতঃ কবি। তাই তাঁর নাট্যসাহিত্যগুলির মধ্যেও তাঁর কবি প্রতিভাই অধিকমাত্রায় পরিস্ফুট। তবে একথা অনস্বীকার্যযে, এর দ্বারা তাঁর নাটকগুলিতে একটি নূতন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে, তাঁর নাট্যপ্রতিভা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। তার প্রমাণ 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকটি। এই নাটকটি বহু স্থলেই তাঁর কবিত্বশক্তির প্রভাবে কাব্যলক্ষণাক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকটি বিশ্বসাহিত্যে সম্মানিত এবং ভারতীয় সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ নাটক বলে প্রশংসিত। শ্রুতি-স্মৃতি, পুরাণ, ছন্দ, অলংকার, সঙ্গীতকলা, চিত্রবিদ্যা, রাজনীতি, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, কামশাস্ত্র, দর্শন, লোকাচার-সকল বিষয়েই ছিল তাঁর সহজ পাণ্ডিত্য।

দৃষ্ট বা কল্পিত, স্থূল বা সূক্ষ্ম, বাহ্য বা আন্তর সকল বিষয়ে নিপুণ বর্ণনার ক্ষমতা কালিদাসের যেন সহজাত। তাই কালিদাসের অভিনবত্ব হ'লো যে, তাঁর নাটকের বর্ণনাই প্রাণ।

Scanned by CamScanner

সুষম ঘটনাবিন্যাস, মধুর সংলাপ ও চরিত্র চিত্রণে তাঁর অসাধারণ দক্ষতাই তার নাটকগুলিকে অকর্ষণীয় করেছে। মানব হৃদয়ের নিগূঢ় রহস্য যেমন তাঁর নিখুঁত ভাবে জানা ছিল তেমনি আবার জীবনধর্মের উপরও যে কল্যাণ ধর্মের সংযমের মাধুর্য আছে; সত্য, শিব ও সুন্দরের যে আদর্শ আছে — সে কথাও তিনি কোনও সময় ভোলেননি। তাই তাঁর কাব্য ও নাটকের অপ্রধান চরিত্রগুলিও অসাধারণ হয়ে উঠছে। জগৎ সম্বন্ধে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও মননের গভীরতা তাঁর রচনাকে দিয়েছে অনুপম পুষ্টি ও অসাধারণ সামর্থ্য। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, গভীর মননশীলতা, বাচিক সংযম ও উচ্চভাবাদর্শবোধ কালিদাসকে করেছে শ্রেষ্ঠ কবি। ঐ গুণগুলি তাঁর কাব্যদেহে পরিস্ফুট হয়ে কাব্যগুলিকে করেছে অনবদ্য।

কালিদাসের কাল ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণ কালিদাসের কাল সম্পর্কে বহু গবেষণা করেও আজ পর্যন্ত একমত হতে পারেননি। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছেন —

হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল ॥

যাহোক, কালিদাসের কাল সম্পর্কে অসংখ্য মতবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মত হলো —

১। প্যারিসের সমালোচক হিপ্পোটাইকশের মতে কালিদাস খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর কবি।

২। উইলিয়ম জেম্‌স্ ও অনেক ভারতীয় পণ্ডিত তাঁকে খ্রীষ্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দীর কবি বলেন।

৩। ল্যাসন তাঁকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের কবি হিসাবে চিহ্নিত করেন।

Keith মনে করেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যিনি বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করে ছিলেন, তাঁরই সভাতেই কালিদাস নবরত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন এবং তাঁর পুত্র কুমারগুপ্তের জন্মকে লক্ষ্য করেই তিনি কুমারসম্ভব কাব্য রচনা করেছিলেন। কুমারগুপ্তের কাল (৪১৩-৪৫৫ খ্রী.) এই সময়ের মধ্যে কালিদাস নিশ্চয় ছিলেন। তার পরবর্তীকালে (৪৬৫-৪৭০ খ্রী.) হূণ আক্রমণে ভারতের জাতীয় জীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠে, তখন কারও পক্ষে কাব্য রচনা সম্ভব নয়। সুতরাং তখন কালিদাস জীবিত ছিলেন না। অতএব Keith-এর মতে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকই কালিদাসের কাল।

৪। কে.বি.পাঠক কালিদাসকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের কবি বলেছেন।

৫। ফার্গুসন, ম্যাক্সমূলার, পি.ভি.কানে, ভাণ্ডারকর প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাঁকে গুপ্তযুগের কবি হিসাবে স্বীকার করে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের কবি বলে অভিহিত করেন।

তবে ঐ সিদ্ধান্তগুলিকে মাথায় রেখে কালিদাস মহারাজ বিক্রমাদিত্যর নবরত্নের প্রধান রত্ন বা অন্যতম রত্ন ছিলেন — এই কিম্বদন্তীর সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করে অনুমান করা হয় যে, কালিদাস খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকে পঞ্চম শতকের কবি।

Scanned by CamScanner

কালিদাসের নাট্য সাহিত্য ঃ কালিদাস ছিলেন সরস্বতীর বরপুত্র আর তাঁর নাটকগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য রত্নরূপ। কালিদাসের মাত্র তিনটি নাটক আছে। নাটকগুলি হ'লো (১) মালবিকাগ্নিমিত্রম্, (২) বিক্রমোর্বশীয়ম্ ও (৩) অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্। উক্ত তিনখানি নাটকই প্রণয়মূলক রোমান্টিক। ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন যে, নাটক তিনটি তিনধরণের দর্শকের উপযোগী করে লেখা। যেমন — মালবিকাগ্নিমিত্র রাজসভার জন্য, বিক্রমোর্বশীয় লোকসভার জন্য এবং অভিজ্ঞান শকুন্তলা বিদগ্ধ সভার জন্য।

(১) মালবিকাগ্নিমিত্রম্ ঃ মালবিকাগ্নিমিত্রটিকে কবির প্রথম জীবনের লেখা বলে অনুমান করা হয়। তার অপর দুইখানি নাটকের ভাষা ও কাব্যকুশলতার সঙ্গে তুলনা করেই এরূপ অনুমান করা হয়েছে। এই নাটকখানিতেই কালিদাসের কবিত্বের প্রথম উন্মেষ ও প্রথম যৌবনের প্রেমের প্রখরতা অনুভূত হয়। এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু হলো —

বিদিশার রাজা অগ্নিমিত্র ও বিদর্ভরাজকন্যা মালবিকার প্রণয় কাহিনীকে উপজীব্য করে পাঁচ অঙ্কে এই নাটকখানি রচিত। এ নাটকের নাটকীয় বিষয়বস্তু হলো — বিদর্ভরাজ মাধবসেন যজ্ঞসেন কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হ'য়ে ভগিনী মালবিকাকে বিদিশাধিপতি অগ্নিমিত্রের হাতে সমর্পণ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পথে দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হ'লে অগ্নিমিত্রের সেনাপতি বীরসেন মালবিকাকে উদ্ধার করেন এবং বিদিশামহীষী ধারিণীর পরিচারিকা হিসাবে রাজান্তঃপুরে রাখেন। একদিন অগ্নিমিত্র মালবিকার প্রতিকৃতি দেখে মুগ্ধ হন। এরপর মালবিকার নৃত্যকুশলতা পরীক্ষা স্থলে তাকে প্রত্যক্ষ করে রাজা তাঁর প্রণয়ানুরাগী হ'য়ে পড়েন। মালবিকার হৃদয়েও রাজার প্রতি অনুরাগ জন্মায়। একদিন উদ্যানে মালবিকার সঙ্গে রাজার ঘনিষ্ঠতা রাজার কনিষ্ঠা মহীষী ইরাবতীর চোখে ধরা পড়ে। ফলে মালবিকাকে অন্তঃপুরে কারাগারে আবদ্ধ করা হলো। বিদূষকের কৌশলে মালবিকা কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে আবার রাজার সঙ্গে মিলিত হন। এবারও ইরাবতী বাধা সৃষ্টি করেন। সে বাধা স্থায়ী হয়নি। এমন সময়ই অগ্নিমিত্রের সেনাপতি বীরসেন যজ্ঞসেনকেপরাস্ত করে মাধবসেনকে মুক্ত করেন ফলে মালবিকার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেল যে, তিনি বিদর্ভরাজ মাধবসেনের ভগিনী ; আবার এই সময়ই সংবাদ আসে যে ধারিণীর পুত্র বিদ্রোহী যবনদের পরাস্ত করেছেন। একসঙ্গে এতগুলি আনন্দবার্তায় উল্লসিতা হয়ে মহীষী ধারিণী মালবিকার সঙ্গে রাজার বিবাহ দিলেন।

এই নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। যেমন শুঙ্গবংশীয় রাজা পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র ও বসুমিত্রের উল্লেখ আছে। এই নাটকটি ভাবগৌরবে মহৎ না হলেও বিষয়ানুকূল রসসৃষ্টিতে কালিদাস এখানে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বিভিন্ন চরিত্র-চিত্রণেও কালিদাসের নিপুণ হাতের স্পর্শ এখানে সুপরিস্ফুট, যেমন বিদূষক চরিত্রটি অপূর্ব সৃষ্টি। প্রণয় ব্যাপারে নায়কের অধৈর্য, মালবিকার আত্মনিবেদন, ইরাবতীর ঈর্ষা, ধারিণীর ব্যক্তিত্ব ও সহিষ্ণুতা এবং কৌশিকীর উদারতার বর্ণনায় কালিদাসের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। এই নাটকে কবির 'পুরাণমিত্যেব ন সাধু

Scanned by CamScanner

সর্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্। ' — এই প্রত্যাশাব্যঞ্জক উক্তিটি সার্থকতা লাভ করেছে।

(২) **বিক্রমোর্বশীয়ম্ ঃ** ঋগ্‌বেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত পুরুরবা ও উবশীর প্রণয় কাহিনীকে উপজীব্য করে মহাকবি কালিদাস পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকটি রচনা করেছেন। নাটকে বর্ণিত বিষয়বস্তু হলো —

চন্দ্রবংশীয় রাজা স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীকে কেশী নামক দানবের হাত থেকে রক্ষা করলে উভয়ের মধ্যে গভীর প্রণয় জন্মায়। কিন্তু উর্বশী স্বর্গে এবং পুরুরবা পৃথিবীতে তখন ফিরে যেতে বাধ্য। তাহলেও পরস্পরের মন পরস্পরের নিকট পড়ে রইল। এরপর প্রেমমুগ্ধ রাজা যখন উদ্যানে বিদূষকের কাছে তাঁর মনের ঐ গোপন কথাটি বলছিলেন তখন উর্বশী অলক্ষ্যে থেকে শুনে পুরূরবার প্রেমে গভীরভাবে আবদ্ধ হলেন। তার ফলেই স্বর্গে 'লক্ষ্মী স্বয়ংবরা' নাটকে উর্বশী লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করার সময় ভুল করে 'পুরুষোত্তম' বলার পরিবর্তে 'পুরূরবা' বলে বসলেন। নাট্যাচার্য ভরতমুনি তাঁকে স্বর্গ ভ্রষ্ট হওয়ার অভিশাপ দিলেন। ইন্দ্র দয়া করে উর্বশীকে মর্ত্যে গিয়ে পুরুরবার সঙ্গে বাস করার অনুমতি দিলেন। সেই সঙ্গে আদেশ দিলেন যে যতদিন পর্যন্ত পুরুরবা পুত্র সন্তানের মুখ দর্শন না করবেন ততদিনই তিনি মর্ত্যে থাকতে পারবেন।

অতঃপর উর্বশীর সঙ্গে পুরুরবা সুখে কাল যাপন করতে করতে একদিন এক নিষিদ্ধ কুঞ্জে প্রবেশ করায় উর্বশী লতায় পরিণত হলেন। পুরূরবা শোকে উন্মত্তের মত উর্বশীকে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে দৈবাৎ সঙ্গমমণি পেয়ে তার সাহায্যে উর্বশীকে ফিরে পেলেন। ইতিমধ্যে উর্বশী গোপনে একটি পুত্র প্রসব করে গোপনেই তাকে লালন পালন করছিল। কিন্তু পিতাপুত্রের সাক্ষাৎ ঘটে গেল। তখনই উর্বশীরও স্বর্গে ফিরে যাওয়ার সময় চলে এল। এ সময় পুরূরবা স্থির করলেন যে তিনি উর্বশীকে ছেড়ে আর সংসারে থাকবেন না বনে চলে যাবেন। এমন সময় দেবর্ষি এসে জানালেন যে তাঁর বনে যাওয়ার প্রয়োজন নাই, কারণ দেবাসুর সংগ্রামে দেবতাদের সাহায্য করার জন্য ইন্দ্র তাঁকে উর্বশীকে সারাজীবন ধরে লাভ করার অনুমতি দিয়েছেন।

মূলকাহিনীটি বিয়োগান্ত হলেও কালিদাস তাঁর কল্পনাগুণে নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুসারে নাটকটিকে মিলনান্ত করেছেন। এই নাটকে পুরূরবার বিরহকালীন যে প্রমত্ত গাথা কবি রচনা করেছেন তা সংস্কৃত সাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি। লোকচিত্তরঞ্জক দৃশ্যকাব্য হিসাবে বিক্রমোর্বশীয়ের সাফল্য অনস্বীকার্য্য।

(৩) **অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ ঃ** মহাকবি কালিদাসের অমর সৃষ্টি অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। এপরিচয় সামান্য। কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ বিশ্বসাহিত্য-ভাণ্ডারের একটি অমূল্যসম্পদ। মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত ও পদ্মপুরাণের কাহিনী অভিজ্ঞান শকুন্তলমের নাট্যবস্তু হলেও কালিদাসের কবি প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত ও কল্পনার রসে রঞ্জিত হয়ে অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ অভিনবত্ব লাভ করেছে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রেম-বিরহ ও মিলনাত্মক সপ্ত অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক।

Scanned by CamScanner

এই নাটকের প্রারম্ভেই দেখা যায়, পুরুবংশীয় রাজা দুষ্যন্ত একটি মৃগের অনুসরণ করতে করতে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের নিকটবর্তী স্থানে জনৈক ঋষির অনুরোধে কণ্বের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তখন আশ্রমে মহর্ষি না থাকায় তাঁর পালিতা কন্যা শকুন্তলার উপর অতিথিপরিচর্যার দায়িত্ব ছিল। অতিথি সৎকারের সময় প্রথম দর্শনেই দুষ্যন্ত শকুন্তলার অনুরাগী হয়ে পড়েন। তারপর এক বুনো হাতীর আগমন ঘটায় শকুন্তলাও তার সখীরা আশ্রমের মধ্যে চলে যায় এবং রাজাও নিজের শিবিরে ফিরে গেলেন। এর পরদিন কণ্বের আশ্রমে রাক্ষসেরা উপদ্রব করছে বলে তাদের দমন করার জন্য কণ্বের দুই শিষ্য রাজাকে আশ্রমে নিয়ে যেতে এলেন। এমন সময় রাজধানী থেকে রাজমাতা ডেকে পাঠিয়েছেন। রাজা কৌশল করে তখন বিদুষককে রাজধানীতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে আশ্রমে গেলেন।

এরপর ঋষিদের অনুরোধে রাজা আশ্রমে অবস্থান করেন এবং শকুন্তলাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন। তারপর শকুন্তলাকে অচিরেই রাজধানীতে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজা তাঁকে একটি আংটি পরিয়ে দিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলে শকুন্তলা যখন পতির চিন্তায় তন্ময় হয়েছিলেন সে সময় আশ্রমে অতিথি হয়ে এলেন দুর্বাসা। কিন্তু শকুন্তলা তন্ময়তার জন্য তাঁর আগমন বার্তা না জানতে পেরে তাঁর উপযুক্ত অভ্যর্থনা সৎকার করলেন না ; ফলে দুর্বাসা রুষ্ট হয়ে অভিশাপ দিলেন যে, তাঁকে তাঁর স্বামী ভুলে যাবে। অনূসূয়া ও প্রিয়ংবদা — শকুন্তলার দুই সখির চেষ্টায় দুর্বাসা কিছুটা শান্ত হয়ে বলেন যে, অভিজ্ঞান দর্শনে এই শাপের পরিসমাপ্তি হবে।

এরপর কণ্ব ফিরে এসে ধ্যানে শকুন্তলার বিবাহ সম্পর্কে জেনে শকুন্তলাকে দুষ্যন্তের কাছে পাঠালেন, কিন্তু দুর্বাসার অভিশাপের ফলে দুষ্যন্ত কোনভাবেই তাঁকে চিনতে পারলেন না। অভিজ্ঞান স্বরূপ দুষ্যন্তের নামাঙ্কিত আংটিটিও আসার পথে সোমতীর্থের জলে হারিয়ে গেছে। দুষ্যন্তের দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলাকে তাঁর মা মেনকা স্বর্গে নিয়ে চলে গেলেন। এদিকে কিছুদিন বাদে সেই হারিয়ে যাওয়া আংটিটি এক ধীবরের কাছ থেকে পেয়েই রাজার সমস্ত কথা মনে পড়ল। কিন্তু তখন শকুন্তলা কোথায় কেউ জানে না। এরপর ইন্দ্রের আহ্বানে রাজ স্বর্গে গিয়ে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে ফেরার পথে মারীচের আশ্রমে এসে পত্নী ও পুত্রের দেখা পেলেন এবং তাদের সঙ্গে আবার দুষ্যন্তের মিলন ঘটল।

অভিজ্ঞান শকুন্তলমের রচনা বৈশিষ্ট্যর জন্য বলা হয়, 'কাব্যেষুনাটকং রম্যং তত্র রম্যা শকুন্তলা'। এর গুণ বা উৎকর্ষের কথা বলে শেষ করা যায় না। ঘটনা বিন্যাসের পারিপাট্যে, সংলাপের অনবদ্যতায়, বর্ণনার সজীবতায়, অলংকার নৈপুণ্যে, ব্যক্তিচরিত্র-কল্পনায়, ভাবের গভীরতায়, আদর্শের ব্যঞ্জনায়, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এবং সকল প্রকার সাহিত্যগুণে এর উৎকর্ষ তর্কাতীত। জার্মান মনীষী গ্যেটে যথার্থ বলেছেন যে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে মর্ত্যের মাধুর্যের সঙ্গে স্বর্গের পূর্ণতা এসে মিশেছে।

Scanned by CamScanner

গদ্যকাব্য

পরিচয় ঃ সংস্কৃত সাহিত্যে দৃশ্য ও শ্রব্য গদ্যকাব্য ভেদে দুপ্রকার। শ্রব্য কাব্যের বিভিন্ন ভাগ আছে; সে সমস্ত বিভাগের মধ্যে গদ্যকাব্য অন্যতম। যদিও গদ্যরচনার প্রচুর প্রশস্তি আছে। বলা হয়, গদ্যরচনাই হলো কবি প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের মাপকাঠি। 'গদ্য কবীনাং নিকষং বদন্তি' তথাপি পৃথিবীর সকল দেশেরই প্রাচীন সাহিত্য ভূমিতে বিচরণ করলে দেখা যাবে সেখানে ছন্দোময় পদ্যই প্রাধান্য লাভ করেছে। ভারতেরও প্রথম সাহিত্য ঋগ্বেদ পদ্যময়। ভারতবাসী প্রথম গদ্যরচনা দর্শন করে যর্জুবেদে। তারপর অথর্ববেদে স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত দেখার পর ব্যাপক দর্শন মেলে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে। ভারতবর্ষে মূলতঃ রস সাহিত্য রচনায় গদ্যের প্রতি উপেক্ষা দেখা গেলেও মননধর্মী সাহিত্য অর্থাৎ বেদান্ত, মীমাংসাদি শাস্ত্র রচনার ক্ষেত্রে গদ্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও উন্নতমানের গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। পতঞ্জলিই রসসাহিত্য-জাতীয় 'বাসবদত্তা', 'সুমনোত্তরা' ও ভৈমরথী' — এই তিনখানি গদ্যকাব্যের নাম উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও বররুচির 'চারুমতী', সোমিলের 'শূদ্রককথা', শ্রীপালিতের 'তরঙ্গবতী' প্রভৃতি কয়েকখানি গদ্যকাব্য এখন নামমাত্রে পর্যবসিত। গদ্যকাব্য প্রণেতা বাণভট্ট গদ্যকাব্য রচয়িতা রূপে ভট্ট হরিচন্দ্র ও আঢ্যরাজের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এদের এই রচনাগুলি কালের গতিতে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে।

সংস্কৃতের বিশাল কাব্য সাহিত্য ভাণ্ডারে অলংকার শাস্ত্র সম্মত গদ্যকাব্যের সংখ্যা মাত্র চারিটি — দণ্ডীর 'দশকুমার চরিতম্' বাণভট্টের 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' এবং সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বেতালপঞ্চবিংশতি, দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা প্রভৃতি বিখ্যাত গদ্যরচনাগুলি সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের অন্তর্গত হলেও গদ্যকাব্যের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যগুলি এগুলির মধ্যে লক্ষিত না হওয়ায় এগুলিকে গদ্যকাব্য হিসাবে গণনা করা হয় না। গদ্যকাব্যের স্বরূপ বা সংজ্ঞা নির্ণয় প্রসঙ্গে দণ্ডী বলেছেন — 'অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যম্' — পাদবিহীন পদসন্নিবেশকে গদ্য বলে। বিশ্বনাথ কবিরাজও প্রায় অনুরূপ সংজ্ঞা করেছেন, 'বৃত্তবন্ধোজ্ঝিতং গদ্যম্'।

গদ্যকাব্যের আবার দুটি ভাগ আছে — ১) কথা ও ২) আখ্যায়িকা। এই দুটি ভাগকে ভারতীয় আলঙ্কারিকরা স্বীকৃতি দিলেও অগ্নিপুরাণে পাঁচটি ভাগের কথা বলা হয়েছে — যথা — ১) আখ্যায়িকা, ২) কথা, ৩) খণ্ডকথা, ৪) পরিকথা, ৫) কথালিকা। তবে সেখানেও কথা ও আখ্যায়িকাকেও প্রাধান্য বা বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গদ্যের সূচনা বলতে ঋগ্বেদের সংবাদ সূক্তগুলিকে নির্দেশ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত গদ্যকাব্যের সূচনাকাল এখনও তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে।

Scanned by CamScanner

দণ্ডী

পরিচয় ঃ সংস্কৃত কাব্য জগতে দণ্ডী হলেন বিরলপ্রতিভাধর এক বিশিষ্ট কবি। কিন্তু দণ্ডীর সামগ্রিক পরিচয় আজও সমালোচনার ধূমে আচ্ছন্ন। পণ্ডিত মহলের তো একটি বিরাট জিজ্ঞাসা — দণ্ডী একজন না তিনজন। এ জিজ্ঞাসার উৎপত্তি দণ্ডীর তিনটি রচনাকে কেন্দ্র করে। রাজশেখরের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, দণ্ডীর রচনা তিনখানি।

ত্রয়োঽগ্নয়স্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়োগুণাঃ।
ত্রয়ো দণ্ডিপ্রবন্ধাশ্চ ত্রিষুলোকেষু বিশ্রুতাঃ ।।

এই তিনখানি রচনা নিয়েও অনেক মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশের অভিমত — (১) কাব্যাদর্শ, (২) দশকুমার চরিত এবং (৩) অবন্তি সুন্দরী কথা — এই তিনখানিই দণ্ডীর কবিপ্রতিভার যথার্থ সাক্ষী। বহুকাল পরে খুঁজে পাওয়া 'অবন্তিসুন্দরী কথা' গ্রন্থটি থেকেই কবির ব্যক্তি পরিচয়ের কিছুটা আভাস মিলেছে। ঐ গ্রন্থ থেকে জানা যায় — কৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে দণ্ডীর জন্ম। তিনি ছিলেন কবি ভারবির প্রপৌত্র ও বীরদত্তের পুত্র। মাতার নাম গৌরী। অতি শৈশবেই তাঁর মাতা পিতা মারা যান। শ্রুত ও সরস্বতী নামে এক দম্পতীর নিকট তিনি লালিত পালিত হন। দণ্ডীর পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ছিল গুজরাটের আনন্দপুরে, পরে তাঁরা দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীতে বসবাস শুরু করেন এবং পল্লবরাজদের একান্ত অনুরাগী ও অনুগত ছিলেন। চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পল্লবরাজকে পরাভূত করে কাঞ্চী অধিকার করলে দণ্ডী দেশ ত্যাগ করেন। আবার পল্লবরাজ নরসিংহবর্মন, (৬৩০-৬৩৮খ্রী.) নিজ সিংহাসন পুনরুদ্ধার করলে দণ্ডী ফিরে আসেন এবং রাজসভায় উচ্চপদে নিযুক্ত হন।

কাল ঃ দণ্ডীর এই সামান্য পরিচয়ের মাধ্যমেই তাঁর আবির্ভাব কাল সম্পর্কে যে বিতর্ক আছে তার কিছুটা সমাধান হয়। যেমন চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কাঞ্চী অধিকার করেছিলেন, সে সময় দণ্ডী বর্তমান ছিলেন। সুতরাং দণ্ডী সপ্তম শতাব্দীর কবি। দ্বিতীয় যুক্তি দণ্ডীর কাব্যাদর্শে ভামহের রচনার উল্লেখ আছে আবার বামন দণ্ডীর সমালোচনা করেছেন। সুতরাং ভামহ ও বামনের মধ্যবর্তী কালকে দণ্ডীর আবির্ভাব কাল হিসাবে চিহ্নিত করলে দণ্ডীকে নিঃসংশয়ে সপ্তম শতকের মাঝামাঝি কালের কবি বলা যায়।

দণ্ডীর কবিপ্রতিভা ছিল অনন্য সাধারণ। প্রাকৃতিক বর্ণনায়, মানবিক রূপগুণ বর্ণনায়, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ পরিহাসে, বাক্‌চাতুর্যে এবং হাস্যরস সৃষ্টিতে দণ্ডীর নৈপুণ্য অসাধারণ। কবি হিসাবে বাল্মীকি ব্যাসের পরই দণ্ডীর নাম কেহ কেহ উচ্চারণ করেন। একটি প্রচলিত উক্তি —

জাতে জগতে বাল্মীকৌ কবি রিত্যভিধাভবৎ।
কবি ইতি ততোব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি ॥

Scanned by CamScanner

কথাটি অতিরঞ্জিত হলেও এককালে যে দণ্ডী যথেষ্ট জনপ্রিয় কবি ছিলেন তা প্রমাণিত হয়।

দশকুমার চরিতম্

দণ্ডীর 'দশকুমার চরিত' আখ্যায়িকা শ্রেণীর একটি গদ্যকাব্য। মূলগ্রন্থটি অসম্পূর্ণ এবং সেখানে মাত্র আটজন কুমারের বিবরণ পাওয়া যায়। পরে চক্রপাণি দীক্ষিত নামক এক দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণপণ্ডিত কর্তৃক সংযোজিত উপসংহার ভাগে একটি উচ্ছ্বাস আছে এবং পূর্বপীঠিকার দুইজন কুমারের বিবরণ পরবর্তীকালেই সংযোজিত হ'য়েছে।

বর্তমানে কাব্যটি যেভাবে পাওয়া যায় তা মূলতঃ তিনভাগে বিভক্ত — (১) পূর্ব-পীঠিকা, (২) উত্তর পীঠিকা এবং (৩) উপসংহার। পূর্বপীঠিকায় ৫ টি, উত্তর পীঠিকায় ৮ টি এবং উপসংহার ভাগে ১ টি উচ্ছ্বাস আছে।

বিষয়বস্তু ঃ দশকুমার চরিত কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়বস্তু হলো —

মগধরাজ রাজহংস মালবরাজ মানসারকে পরাস্ত করার পর পুনরায় মালবরাজ কর্তৃক নিজে পরাস্ত হয়ে পত্নী বসুমতী সহ বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় নিলেন। সেখানেই তাঁর একটি পুত্র জন্মাল, নাম-রাজবাহন। নানা ঘটনার মাধ্যমে মগধরাজের বন্ধু ও মন্ত্রীদের নয়টি শিশুপুত্রও সেখানে আনীত হল। রাজকুমারের সঙ্গে অপহারবর্মা, উপহারবর্মা, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, অর্থপাল, প্রমতি, সোমদত্ত, পুষ্পোদ্ভব ও বিশ্রুত এই নয় মন্ত্রিপুত্রও বড় হতে লাগল। তারপর ঋষি বামদেবের পরামর্শ অনুসারে রাজহংসের অনুমতি ক্রমে নয়কুমারসহ রাজবাহন দিগ্বিজয়ে বাহির হলেন। পথে রাত্রি যাপনের সময় রাজকুমার এক ব্রাহ্মণ বেশী কিরাতের অনুরোধে তার উপকার করে যখন ফিরলেন তখন তাঁর বন্ধুরা তাঁকে খুঁজতেই নানা দিকে চলে গেছেন। রাজবাহনও তাঁদের খুঁজতে বেরিয়ে অবন্তীনগরে এসে প্রথমে পুষ্পোদ্ভবের সাক্ষাৎ পান। সেখানেই রাজকুমারী অবন্তিসুন্দরীর সঙ্গে প্রণয় ও তাঁকে বিবাহ করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বাকি আটজন কুমারও এসে রাজবাহনের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী বললেন। এই ভাবেই কাহিনীর বিকাশও সমাপ্তি ঘটেছে। দশকুমারচরিত গ্রন্থখানি দশজন কুমারের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতালব্ধ বিচিত্র কাহিনীর আলেখ্যমালা।

কাব্যটি সংস্কৃত সাহিত্যের গতানুগতিকতামুক্ত এবং জীবন রসে উচ্ছল। কবি এই কাব্যে নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্তে তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্রগুলিই সাফল্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। সে কারণ সমাজের ক্ষতস্বরূপ লোভ, অসাধুতা, প্রতারণা, নারীহরণ, চুরি প্রভৃতি সামাজিক নিন্দনীয় দিকগুলিকে যথাযথ চিত্রিত করেছেন। সাধারণভাবে দণ্ডীর রচনাশৈলী অত্যন্ত সহজ, সরল। তথাপি গদ্যকাব্যের রীতি অনুসারে স্থানে স্থানে গৌড়ীয়রীতি এবং সমাসবহুল ও ওজোগুণের সমাবেশ ঘটলেও তাঁর রচনা অযথা পাণ্ডিত্যের ভারে দুর্বোধ্য হয়নি।

Scanned by CamScanner

বাণভট্ট

পরিচয় ঃ সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের আকাশে বাণভট্ট উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ। ভারতীয় প্রাচীন কবিসাহিত্যিকগণ প্রায়ই নিজের পরিচয় দানে নীরবতা পালন করেছেন। সেক্ষেত্রে বাণভট্ট ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর রচনায় নিজের সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়ে গেছেন। তার মাধ্যমেই জানতে পারা যায় যে, তিনি বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পুরুষানুক্রমিক পরিচয় হলো — কুবেরের পুত্র পশুপতি, পশুপতির পুত্র অর্থপতি, অর্থপতির পুত্র চিত্রভানু এবং চিত্রভানুই হলেন বাণভট্টের পিতা। মাতার নাম রাজ্যদেবী। শোণনদীর তীরবর্তী প্রীতিকূট নামক স্থানে তার জন্ম। শৈশবেই মাতৃবিয়োগ হয় এবং কৈশোরে পিতার মৃত্যু হয়। মাতাপিতাকে হারিয়ে বাণ কুসঙ্গে পড়ে গৃহত্যাগ করে বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে গৃহে ফেরেন। পরে তিনি মহারাজ হর্ষবর্ধনের সভাকবির পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল ৬০৬-৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব বাণভট্ট ঐ সময়ের কবি — এ বিষয়ে কোন সংশয় বা দ্বিমত নাই।

রাজা হর্ষবর্ধনের অনুপ্রেরণায় ও সহায়তায় কবি 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী' নামে দুইটি গদ্যকাব্য রচনা করে তাঁর কবি প্রতিভার অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

মহাকবি বাণ ভাষার বৈভব সৃষ্টিতে, শব্দের গাম্ভীর্য প্রদর্শনে এবং বর্ণনা-বৈচিত্র্য সম্পাদনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর অসামান্য কবি প্রতিভার প্রশস্তিতে সংস্কৃত কবিগণ এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যরসিকগণ অত্যন্ত মুখর। ধনপাল বলেছেন, 'কেবলোঽপি স্ফুরন্ বাণঃ করোতি বিমদান্ কবীন্'। অর্থাৎ একা বাণই সকল কবির দর্প নাশ করেছেন। প্রবাদ আছে, — 'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্'। ওয়েবর সাহেব বলেন, 'বাণের গদ্য যেন ভারতীয় অরণ্যানী'। কীথ বাণের রচনায় মুগ্ধ হয়ে বলেছেন, বাণের রচনায় সুগভীর বিশ্বজনীন ভাবানুভূতি ও সৌন্দর্যানুভূতি আছে।

হর্ষচরিত

মহাকবি বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' সংস্কৃত সাহিত্যে একটি বিখ্যাত আখ্যায়িকা শ্রেণীর কাব্য। গ্রন্থটি আটটি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উচ্ছ্বাসের অর্ধভাগ পর্যন্ত বাণ আত্মকথা বর্ণনা করেছেন। তারপর আরম্ভ করেছেন সম্রাট হর্ষবর্ধনের জীবন কাহিনী। কবি গ্রন্থটি শেষও করেন নি ; এর মধ্যে হর্ষবর্ধনের সমগ্র জীবন বৃত্তান্ত নাই।

স্থানীশ্বরের পুষ্যভূতিবংশীয় রাজা প্রভাকর বর্ধনের দুই পুত্র রাজ্যবর্ধন, হর্ষবর্ধন এবং এক কন্যা রাজ্যশ্রী। মৌখরীরাজ গ্রহবর্মার সঙ্গে রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যুর পর মালবরাজ কর্তৃক গ্রহবর্মা নিহত এবং রাজ্যশ্রী কারারুদ্ধ হন। রাজ্যবর্ধনের

Scanned by CamScanner

যুদ্ধযাত্রা কালে গৌড়াধিপ শশাংকের চক্রান্তে মৃত্যু হয়। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে মালবরাজ দেবগুপ্ত ও শশাংকর বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধন যুদ্ধযাত্রা করে পথে জানতে পারলেন যে ভগিনী রাজ্যশ্রী শত্রুর কারাগার থেকে পালিয়ে বিন্ধ্যারণ্যে চলে গেছে। হর্ষবর্ধন তৎক্ষণাৎ সেদিকে যাত্রা করে বিন্ধ্যারণ্যে গিয়ে আগুনে প্রাণ বিসর্জন করতে উদ্যতা ভগিনীকে দেখতে পেলেন এবং ধরে ফেললেন। ভ্রাতা ভগিনীর মিলনেই এই কাব্যের সমাপ্তি ঘটেছে।

'হর্ষচরিত' কাব্যটি বাণভট্টের প্রথম রচনা এবং সংস্কৃত সাহিত্যে ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত প্রাচীনতম কাব্য। বিশেষ করে তিনি কতকগুলি স্থলে কাব্যশিল্পকে মুখ্য করে তুলেছেন। যেমন দিবাকর মিত্রের আশ্রমে সর্বধর্ম সমাবেশ বর্ণনা, রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধান কালে প্রভাত বর্ণনা, প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যুতে প্রিয়জনের শোক বিহ্বলতা বর্ণনা প্রভৃতি প্রকৃত কাব্য সুষমামণ্ডিত। কবি গ্রন্থটিতে সমসাময়িক যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্রগুলিকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই সঙ্গে বর্ণনার বৈচিত্র্যে, শব্দের গাম্ভীর্য, মাধুর্যে ও মণ্ডনকলার চাতুর্যে কবি এটিকে যথার্থ কাব্যধর্মীও করে তুলেছেন। এককথায় হর্ষচরিত কবি বাণভট্টের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অতুলনীয় বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন।

কাদম্বরী

'কাদম্বরী' মহাকবি বাণভট্টের যেমন শ্রেষ্ঠ কাব্যকৃতি, সেইরূপ সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কাদম্বরী শব্দের অর্থ সুরা। 'কাদম্বরী' কাব্যের রসামৃত পান করলে সুরাপানের মত মাদকতা জন্মায়, আর অন্য আহারে রুচি থাকে না। তাই বলা হয়েছে, — 'কাদম্বরী রসজ্ঞানামাহারোঽপিন রোচতে'। 'কাদম্বরী' কথা শ্রেণীর কাব্য। হর্ষচরিতের মত কাদম্বরী কাব্যটিও কবি শেষ পর্যন্ত লেখেননি। কেবল পূর্বভাগই বাণের রচনা। উত্তর ভাগটি বাণপুত্র ভূষণভট্ট লিখেছেন। তিনি এখানে মহাশ্বেতা পুণ্ডরীকের মিলন ঘটিয়ে গ্রন্থের সমাপ্তি সাধন করেছেন। এই কাব্যে বর্ণিত কাহিনীর বক্তা হলো, বিদিশাধিপতি শূদ্রকের রাজসভায় চণ্ডাল কন্যা কর্তৃক আনীত একটি শুকপাখী।

পাখীটি মহর্ষি জাবালির মুখে শোনা একটি ঘটনাবহুল কাহিনী বলেছিল।

উজ্জয়িনীর রাজা তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রাপীড় ও মন্ত্রী শুকনাসের পুত্র বৈশম্পায়ন শৈশব থেকে এক সঙ্গে লালিত হয়ে একই সঙ্গে একই বিদ্যাভবন থেকে শিক্ষিত হয়ে উঠলেন। চন্দ্রাপীড় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে একদিন বৈশম্পায়নের সঙ্গে দিগ্বিজয়ে বাহির হলেন। একদিন চন্দ্রাপীড় এক কিন্নর দম্পতীকে অনুসরণ করতে করতে অচ্ছোদ সরোবরের নিকট উপস্থিত হলেন। সেখানে অপূর্ব সঙ্গীতধ্বনি শুনে সেদিকে অগ্রসর হয়ে একটি শিবমন্দিরে মহাশ্বেতা নামে এক অসামান্য রূপবতী তরুণী তপস্বিনীকে দেখতে পেলেন। চন্দ্রাপীড়ের আগ্রহে মহাশ্বেতা তাঁর জীবনের করুণ কাহিনী বললেন, —

Scanned by CamScanner

পুন্ডরীক নামে এক মুনিকুমার ও মহাশ্বেতা পরস্পরের প্রতি গভীরভাবে প্রণয়াসক্ত হয়েছিলেন। মুনিকুমারের আকস্মিক মৃত্যু হলে মহাশ্বেতা শোকে উন্মাদিনী হয়ে প্রাণত্যাগ করতে উদ্যত হন। তখন এক দেবতা পুণ্ডরীকের মৃত শরীরটি নিয়ে যেতে যেতে দৈববাণী করলেন যে যথাকালে আবার তাঁদের মিলন হবে। তাই মহাশ্বেতা নিয়ম-ব্রত পালন করে প্রিয়তমের মিলনের প্রতীক্ষা করে চলেছেন। তারপর মহাশ্বেতার প্রিয়সখী কাদম্বরীর সঙ্গে চন্দ্রাপীড়ের সাক্ষাৎ ঘটে এবং উভয়ের হৃদয়েই পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় প্রণয় জন্মায়। ইত্যবসরে তারাপীড়ের আদেশ পেয়ে চন্দ্রাপীড়কে উজ্জয়িনীতে ফিরে যেতে হলো। তখন চন্দ্রাপীড় তাঁর হৃদয়ের সংবাদ জানাবার জন্য সহচরী তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী পত্রলেখাকে কাদম্বরীর কাছে পাঠালেন। পত্রলেখা আবার সেখান থেকে চন্দ্রাপীড়ের প্রতি কাদম্বরীর গভীর প্রেমের সংবাদ নিয়ে উজ্জয়িনীতে গেলেন এবং চন্দ্রাপীড়কে জানালেন। এই পর্যন্তই পূর্বভাগ অর্থাৎ এই পর্যন্তই বাণভট্টের রচনা।

উত্তর ভাগে বাণপুত্র ভুষণভট্ট কাদম্বরী ও চন্দ্রাপীড়ের এবং মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীকের মিলন কাহিনী সংযোজিত করে গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেছেন। উত্তরভাগের বিষয়সার হলো, বন্ধু বৈশম্পায়নের খোঁজে চন্দ্রপীড় পুনরায় মহাশ্বেতার কাছে এলেন, এদিকে মহাশ্বেতাকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে তার শাপে বৈশম্পায়ন শুকপাখী রূপে জন্মেছেন। বন্ধুর এই হৃদয়বিদারক পরিণতির কথা শুনে চন্দ্রাপীড় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর বিরহে কাদম্বরী প্রাণত্যাগ করতে উদ্যত হলে দৈববাণী হয় যে মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী যথাসময়ে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হবেন। জাবালির মুখে এই কাহিনী শুনে শূদ্রক ও শুকপাখীর পূর্বাকৃতি জেগে উঠল, উভয়েই দেহত্যাগ করলেন এবং জীবিত হয়ে পুনরায় চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীর সাথে ও বৈশম্পায়ন পুণ্ডরীক রূপে মহাশ্বেতার সঙ্গে মিলিত হলেন।

কবি বাণভট্ট বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রূপ, রস নিজে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেই যেন কাদম্বরী কাব্যখানি সৃষ্টি করেছেন। এই কাব্যে অতি সামান্য বস্তুকেও কল্পনার রঙ মিশিয়ে উপভোগ্য ও মধুর করে তুলেছেন। বাণের কাব্য ভাষার কাঠিন্যে, সমাসের বাধায়, শ্লেষালঙ্কারের বাহুল্যে স্থান বিশেষে দুর্বোধ্য এবং তার কল্পনার আতিশয্য ও মাত্রাবোধের অভাব বশতঃ আধুনিক রুচিতে নিন্দিত হলেও সে সময় এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাঁর এই কাব্যখানি সুধীসমাজে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছিল। শব্দচয়নে, অর্থবন্ধনে, বাক্যবিন্যাসে, অলঙ্কার সজ্জায়, রস পরিবেশনে, চরিত্রচিত্রণেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় বাণভট্টের অতুলনীয় শক্তির পরিচয় কাদম্বরী কাব্যে নিহিত।

Scanned by CamScanner

রাজনৈতিক সামাজিক ও ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নানা বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করেই N.M.Penger কথাসরিৎসাগর রচয়িতা সোমদেবকে কল্পকথার জনক ও তাঁর রচনাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতির অন্যতম বলে অভিহিত করেছেন।

গীতিকাব্য

সূচনা ঃ ইংরাজীতে Lyric poetry শব্দটির বাংলা অনুবাদ করে গীতিকাব্য নামের সৃষ্টি। কিন্তু ইংরাজীতে লিরিক বলতে যে জাতীয় রচনাকে বুঝায়, সংস্কৃত সাহিত্যে সে জাতীয় রচনা নাই বললেই চলে। সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপকতা আরও অনেক বেশি। মূলতঃ সংস্কৃতের 'খণ্ডকাব্য' জাতীয় রচনাগুলিকে পাশ্চাত্ত্যের লিরিক জাতীয় রচনার পর্যায়ে ফেলা হয়। আধুনিক লিরিক বা গীতিকাব্যের বৈশিষ্ট্য হলো, — কবি হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি ও অন্তরের অন্তস্তল হতে উৎসারিত ভাবাবেগ গুলির বাণীময়রূপ। তাই মহাকাব্য অপেক্ষা এর আবেগের অভিব্যক্তি সুকুমারতর ও অনুভূতি প্রগাঢ়তর।

সাধারণতঃ লিরিক কবিতাগুলি হয় (১) আকারে ক্ষুদ্র, বাহুল্যবর্জিত ও সঙ্গীতধর্মী।

(২) একটি মাত্র কল্পনার আলেখ্যেই এগুলি পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে।

(৩) কোন প্রকার জটিলতা নেই।

(৪) কাব্যে বা নাটকে কবি থাকেন তাঁর সৃষ্টির বাইরে, কিন্তু এখানে কবি তাঁর চিন্তা ও অনুভূতির অনুপ্রেরণা নিয়ে ধরা দেন নিজের সৃষ্টির মধ্যে।

সহজ কথায় গীতিকাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করলে বলতে হয় যে, যে কাব্যের দ্বারা গীতের উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাই গীতিকাব্য। তা প্রেমের বা বিরহের বা ভক্তির যাই হোক না কেন, যখন গীতিময় কাব্যরূপ লাভ করে তখনই তা গীতিকাব্য নামে চিহ্নিত হয়। গীতিকাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত সংজ্ঞাটি যথার্থ — 'যে গান কানে যায় না শোনা সে গান যেথায় নিত্য বাজে।'

সংস্কৃত সাহিত্যের গীতিকাব্য বা লিরিক সম্পর্কে ম্যাকডোনেল বলেন যে, সংস্কৃতে এমন কতকগুলি গীতিকাব্য আছে যেগুলি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লিরিক কবিতাগুলির সমপর্য্যায় ভুক্ত হওয়ার যোগ্য। সংস্কৃত গীতিকবিতাগুলি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন — (১) প্রেমমূলক, (২) ভক্তিমূলক ও (৩) নীতিমূলক। ভারতের গীতিকবিতার ইতিহাস প্রাচীন। বেদে অনেকগুলি এ জাতীয় সূক্ত আছে। আধুনিককালেও ভারতের সাহিত্য ভাণ্ডারে গীতি কবিতার স্থান নিতান্ত নগণ্য নয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের গীতিকাব্যগুলিকে সাধারণতঃ চারভাগে ভাগ করা যায়।

(১) প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা। তার নির্দশন কালিদাসের 'ঋতুসংহার'। (২) প্রেম মূলক কবিতা। তার উদাহরণ — কালিদাসের 'মেঘদূত', জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ'

Scanned by CamScanner

প্রভৃতি। (৩) নীতিবিষয়ক কবিতা। যেমন ভর্তৃহরির 'নীতি-শতক', 'বৈরাগ্য শতক' প্রভৃতি। (৪) ভক্তিমূলক কবিতা। যেমন — বিভিন্ন দেবদেবীর স্তোত্র সমূহ।

মেঘদূত

প্রেমমূলক গীতিকাব্য হিসাবে কালিদাসের মেঘদুত বিশ্ববন্দিত। আদ্যোপান্ত মন্দাক্রান্তা ছন্দে নিবদ্ধ প্রায় শতাধিক পদে রচিত এই প্রেমমূলক কাব্যটি পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ দুইটি অংশে বিভক্ত। কাব্যটি নিতান্তই বস্তুভারহীন এবং আত্মভাবনাময়। প্রিয়াবিরহের দীর্ঘশ্বাসে ও প্রিয়ামিলনের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ।

পূর্বমেঘের বিষয়বস্তু হলো — কোন এক যক্ষ কর্তব্যকর্মে অবহেলার ফলে প্রভু কর্তৃক নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে সুদূর রামগিরি আশ্রমে কোনক্রমে কাল কাটাচ্ছিল। ইত্যবসরে এল বর্ষা। আষাঢ় মসের প্রথম দিনে একখণ্ড কালো মেঘ দেখেই তার হৃদয় প্রিয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। বিরহী যক্ষ তখন চেতন অচেতন ভুলে ঐ মেঘকেই প্রিয়ার নিকট বার্তা পাঠাবার জন্য দূত হিসাবে নিয়োগ করল। এরপর কবি রামগিরি থেকে অলকাপুরী পর্যন্ত পথের বিবরণ দিয়ে চলেছেন। সেই পথে রূপ, রস ও সৌন্দর্যের বিচিত্র সমাবেশে কামার্তের কামনার প্রতিফলন ঘটেছে। কবি রামগিরির সানুদেশ থেকে উজ্জয়িনীর মধ্য দিয়ে বহু নদী, নালা, পর্বত পার হয়ে শেষে কৈলাস ও অলকার স্বপনপুরীতে যাবার পথ দেখিয়েছেন মেঘকে। পূর্বমেঘ এইভাবে পথের নির্দেশেই শেষ হয়েছে।

উত্তরমেঘে আছে অলকাপুরীর বর্ণনা। স্বর্গতুল্য সেই অলকাপুরীতে দুঃখ নাই দারিদ্র্য নাই। তার সঙ্গে আছে যক্ষপ্রিয়ার রূপলাবণ্য ও বিরহ ব্যথার কাতরতার বর্ণনা। এরপর জানিয়েছে যে মেঘ যেন তার একবেণীধরা প্রেয়সীকে পুনরায় মিলনের সম্ভাবনা জানিয়ে আশ্বস্তা করে — এই দুঃখের দিন অবশ্যই কেটে যাবে, মানুষের সুখ-দুঃখ চিরকাল সমান যায় না।

অবশেষে যক্ষ তার বার্তাবহনের প্রতিদান স্বরূপ কিছু দেওয়ার অক্ষমতা প্রকাশ করে কেবল নিজের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে বলেছে যে, মেঘকে যেন ক্ষণকালের জন্যও তার প্রিয়তমা বিদ্যুতের বিচ্ছেদ না সহ্য করতে হয়।

'মেঘদূত' গীতিকাব্যটি কালিদাসের এক অনবদ্য সৃষ্টি। ভাব ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে, রসের গভীরতায়, ছন্দের চমৎকারিত্বে এবং ভাষা ও বর্ণনার পারিপাট্যে কাব্যটি অতুলনীয়। কালিদাসের প্রতিভাস্পর্শে এখানে জড় প্রকৃতি সচেতন ও হৃদয়ানুভূতি সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। কেবল বিরহকে উপজীব্য করে ভারতীয় সাহিত্যে যে সকল কাব্য রচিত হয়েছে,তাদের মধ্যে মেঘদূতই প্রাচীনতম ও সর্বোত্তম। পরবর্তীকালে মেঘদূতের অনুকরণে অন্ততঃ পঞ্চাশটি দূতকাব্য রচিত হয়েছে। এরদ্বারা মেঘদূতের অসাধারণ প্রভাব ও জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়।

Scanned by CamScanner

গীতগোবিন্দ

পরিচয় ঃ 'গীতগোবিন্দ' নামকগীতিকাব্যের রচয়িতা কবি জয়দেব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে অবির্ভূত হয়েছিলেন। কবি জয়দেব পশ্চিমবাংলার বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ভোজদেব এবং মাতার নাম বামা দেবী বা রামাদেবী। তাঁর কাব্যে তাঁর পত্নীর নামও দেখা যায় পদ্মাবতী। লোকপ্রসিদ্ধি যে, জয়দেব বাংলার শেষ স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন।

কাব্য পরিচয় ঃ 'গীতগোবিন্দ' কাব্যটি প্রেমবিষয়ক গীতিকাব্য হলেও আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। ভক্ত কবি জয়দেব এই কাব্যে রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব বসন্তলীলা বর্ণনা করেছেন। নায়ক নায়িকা বা সখীর সঙ্গীতময় উক্তি প্রত্যুক্তিচ্ছলে কাব্যটি রচিত। আধুনিক পরিভাষায় এটিকে গীতিনাট্য হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। অধ্যাপক ল্যাস্‌সেন এটিকে গীতধর্মী নাটক বলেছেন। ঘটনার ক্রম অনুসারে কাব্যটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারোটি সর্গে বিভক্ত এর মধ্যে সর্বসমেত ২৪টি গীত ৮০টি শ্লোক আছে। কথিত হয়, পদ্মাবতীর প্রগাঢ় প্রেমই তাঁকে এই অপ্রাকৃত প্রেমের প্রেরণা দিয়েছিল এবং সেই প্রেরণার ফলেই ভক্ত কবি মানস দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব লীলাভিনয়। কাব্যটির বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো —

বসন্তকাল সমাগত। প্রেমলীলার পরমনায়ক শ্রীকৃষ্ণ ও পরমনায়িকা রাধা পরস্পরই মিলন কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এসময় সখীমুখে শ্রীরাধার হৃদয়ের অবস্থা জানতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কুঞ্জে আসতে বললেন। কিন্তু শ্রীরাধা তখন শ্রীকৃষ্ণবিরহে এমনই কাতরা যে চলচ্ছক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন। তাই তিনি কৃষ্ণকেই আসার জন্য অনুরোধ করে পাঠালেন। শ্রীকৃষ্ণ আসবেন জেনে শ্রীরাধা সারারাত্রি প্রতীক্ষা করলেন। শেষে বিলাপের মধ্য দিয়েই তাঁর রাত্রি শেষ হলো। এদিকে রাত্রি শেষ হতে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হলেন। অভিমানিনী রাধার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়, মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তীব্র ভর্ৎসনা বাক্য। শেষে সখীর উপদেশে ও চেষ্টায় রাধার ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত হলে শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘকাল ধরে অনুনয় বিনয়ে তাঁর প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হলেন। এরপর শ্রীরাধাকৃষ্ণের শাশ্বত মিলন বর্ণনা দ্বারাই গ্রন্থের সমাপ্তি।

গীতগোবিন্দকাব্যের সর্গানুসারী বিষয় বিন্যাস হলো — ১ম সর্গে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিরহব্যাকুলতা, ২য়সর্গে উভয়ের মিলনোৎকণ্ঠা, ৩য়সর্গে শ্রীকৃষ্ণের রাধাচিন্তা, ৪র্থসর্গে শ্রীকৃষ্ণের কাছে রাধার অবস্থা নিবেদন, ৫মসর্গে অভিসারিণী রাধার প্রতীক্ষা, ৬ষ্ঠসর্গে শ্রীকৃষ্ণসমীপে রাধার সঙ্কেত প্রেরণ, ৭মসর্গে কৃষ্ণ অদর্শনে রাধার বিলাপ, ৮মসর্গে শ্রীরাধার মান, ৯মসর্গে রাধার মানভঞ্জনের জন্য কৃষ্ণের ব্যাকুলতা,দশম সর্গে শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়, একাদশ সর্গে উভয়ের মিলন সম্ভাবনা এবং দ্বাদশ সর্গে রাধাকৃষ্ণের মিলন।

গীতগোবিন্দ কাব্যটি সংস্কৃত সাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টির সাক্ষ্যবহন করে।

Scanned by CamScanner

কাব্যটির মৌলিকতা ও বৈচিত্র্য দর্শনীয় তথা প্রশংসনীয়। ভক্তিমিশ্রিত শৃঙ্গাররসে পূর্ণ এবং মধুর, কোমল কান্ত পদাবলীতে গ্রথিত এই কাব্যটির মাধুর্য অতুলনীয়। রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেমবিলাসকে কবি ভক্তিরসের মিশ্রণে দৈবীলীলায় পরিণত করেছেন। মিলন, বিরহ, প্রতীক্ষা অভিমান প্রভৃতি প্রেমের সকল চিত্রই কবির বর্ণনানৈপুণ্যে উজ্জ্বল ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। গীতগোবিন্দর কোমলপদগুলি ছন্দের ঝঙ্কারে এবং যমক ও অনুপ্রাসের ললিত লহরীতে স্বতঃই শ্রোতৃবর্গের চিত্তকে আনন্দরসে প্লাবিত করে। বাংলার পদাবলী সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিরাজ জয়দেব আদিগুরু হিসাবে সমাদৃত। জয়দেব সম্পর্কে কবি সত্যেন্দ্রনাথের উক্তি বিশেষ উল্লেখ্য —

বাংলার রবি জয়দেব কবি কান্তকোমল পদে।
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন কোকনদে॥

Scanned by CamScanner